Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 426 - 431
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 426 - 431
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

পারমার্থিক দৃষ্টি ও ব্যবহারিক দৃষ্টি : একটি অদ্বৈতবাদী আঙ্গিক

অলোক মন্ডল
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
গভঃ জেনারেল ডিগ্রি কলেজ গোপীবল্লভপুর টু
বেলিয়াবেড়া, ঝাড়গ্রাম
Email ID: alokemondalbzn@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
সৎ, অসৎ, কল্পনা, ব্রহ্মকারবৃত্তি

Abstract

পারমার্থিক দৃষ্টি ও ব্যবহারিক দৃষ্টি - এই কথা দুটি অদ্বৈত বেদান্তে সুপরিচিত। 'পরমার্থ' বলতে বোঝায় যা জীবের পরম কাম্য। পরমকাম্য হল সেই পদার্থ, যা অন্যান্য কাম্য এর তুলনায় কাম্যতর। পারমার্থিক দৃষ্টি হল সত্যদৃষ্টি অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান। ব্যবহারিক দৃষ্টি হল ঐ রূপ জ্ঞান, যার সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সুচারুরূপে নির্বাহিত হয়। জীবনযাত্রার উপযোগীতাই ব্যবহারিক জ্ঞানের লক্ষণ। ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয় সত্য নয়; কিংবা তা হল অপূর্ণ সত্য অথবা ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয় মিথ্যা অবভাস অথবা অ-বস্তু। ব্যবহারিক সৎ, সৎ বলে প্রতীয়মান হলেও তাত্ত্বিক বিবেচনায় তা সৎ নয় আবার বন্ধ্যাপুত্রের মতো অসৎ ও নয়। যেহেতু তা সৎ নয়, অসৎ ও নয়, এই ভাবে সদঅসদভ্যামঅনির্বাচ্য বলেও নির্দেশ করা যায়। এই অর্থে মিথ্যাবস্তুকে অসৎ বলে আখ্যায়িত করা যায়। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টির ধারণাটি সম্ভবপর হয় কিরূপে? আমাদের বিচারপ্রণালী কি সর্বদাই সম্যকপথে পরিচালিত হয়? এই দার্শনিক প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অনেক সময়ই সাধারণ জীবনযাত্রার প্রতি অনেকেরই বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। সেই বিতৃষ্ণাজনিত তৃষ্ণাকে অলৌকিক বলা অসঙ্গত। এটি হল আধ্যাত্মিক মুক্তির তৃষ্ণা। বিচার তথা দার্শনিক এর সাধারণ উদ্দেশ্য হল ঐ তৃষ্ণারূপ পরিচয়টিকে স্পষ্টিকরণ ও সুস্পষ্ট করা। এই স্পষ্টিকরণ ও গাঢ় পরিচয়ের অপর নাম ব্রহ্মকারবৃত্তি। এটিই হল তত্ত্বানুভূতি কিংবা পারমার্থিক দৃষ্টি।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 426 - 431
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

বেদের অন্ত বেদান্ত। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের একটি শাখা বেদান্ত নামে পরিচিত। বেদান্তে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং দার্শনিক ব্যাখ্যা র সংমিশ্রণ দেখা যায়। বেদান্ত দর্শনের একটি ধারা হল অদ্বৈতবাদী অভিমত। খ্রিস্টাব্দের অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য অদ্বৈততত্ত্ব এর যুক্তিগত ব্যাখ্যা রচনা করেন। অদ্বৈত মতে মূল সত্তা হল এক ঈশ্বর। ঈশ্বর - নির্গুণ, নিঃশর্ত এবং নিঃসংজ্ঞেয়। অর্থাৎ ঈশ্বর সংজ্ঞার অতীত। কিন্তু বিশ্বের বিচিত্র অস্তিত্বের ব্যাখ্যা কি? অদ্বৈতমতে, বিশ্বের বৈচিত্র মায়া, সত্য নয়। অবিদ্যার কারণেই মানুষের মনে এই মায়া বা বস্তুকে সত্য ধারণার ভ্রমের সৃষ্টি হয়। সত্য জ্ঞানের পথ হল সজ্ঞা। ইন্দ্রিয় বা অনুমান আমাদের যথার্থ জ্ঞান দান করতে পারে না। ব্যক্তির সাধনা হবে মায়ারূপ বৈচিত্রের অন্তরালে যথার্থ ঐক্য এবং সত্তার জ্ঞান লাভের সাধনা করা।

সাধারণ ভাবে পরমার্থ বলতে বোঝায় কাম্য। পুরুষার্থ বলতে বোঝায় জীব বা পুরুষ যা চায় বা পেতে ইচ্ছা করে। অতএব, পরমার্থ হল যা জীবের পরমকাম্য। পরমকাম্য হল ঐ পদার্থ, যা অন্যান্য কাম্যর তুলনায় কাম্যতর।[১] ভারতীয় দর্শনে এই পরমার্থ পদার্থটিকে সাধারণত আত্যান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি বলে মনে করা হয়, আবার কখনও কখনও তা অনন্ত আনন্দ বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং, পারমার্থিক দৃষ্টির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হবে ঐরূপ জ্ঞান, যা এই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি অথবা পরিপূর্ণ আনন্দ এনে দেয়, কিংবা তা প্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষাৎ ভাবে বা পরম্পরায় সাহায্য করে। এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ব্যতিরিক্ত, সেটির সর্ববাদীসম্মত অপর ও মুখ্যঅর্থ হল সত্যদৃষ্টি কিংবা সম্যকজ্ঞান। যাঁরা এই সম্যকদৃষ্টিকে 'পারমার্থিক দৃষ্টি' নামে অভিহিত করেছেন, তাঁদের এই নামের মধ্যে এই কথাও গৃহীত থাকে যে, এই সত্যদৃষ্টি পরমপুরুষার্থ লাভের উপায়।

ব্যবহারিক দৃষ্টি হল ঐরূপ জ্ঞান, যার সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সুচারুরূপে নির্বাহিত হয়। আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা বা ইচ্ছাপূর্তি, আরামদায়ক খাদ্য অভ্যাস, চিত্ত বিনোদন, দীর্ঘ জীবন লাভ করার জন্যে যেরূপ জ্ঞান আবশ্যক তাকে ব্যবহারিক আখ্যা দেওয়া হয়। এই উপেয় - উপায়ের জ্ঞানে কিভাবে কি সম্পাদন করা যায়, শুধু যে তারই জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত এমন নয়, উপরন্তু পদার্থসমূহের সাজাত্য ও বৈজাত্য প্রভৃতির জ্ঞান এবং এই সকল জ্ঞানকে যে সকল নিয়মের সূত্রে একতাবদ্ধ করা সম্ভবপর, সেই সকল নিয়মের জ্ঞান ও এই ব্যাবহারিক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু উপায় ও উপেয় ভাবের জ্ঞান জীবনযাত্রা নির্বাহের কাজে অতি আবশ্যক, সুতরাং, সেটিকে ব্যবহারিক নাম দেওয়া যুক্তিসংগত।[২] কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অব্যবহার্য বহু বৈজ্ঞানিক বিধান আছে এবং থাকাই স্বাভাবিক। তাহলে তাদেরকে কি করে ব্যবহারিক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে? উত্তরে বলা যায় যে, এদেরও ভবিষ্যতে কার্য উপাযোগী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিধানের মধ্যে এক বা একাধিক ঐক্যসূত্র বের করার ব্যাপারে এদের উপযোগীতা থাকতে পারে; এবং যতবেশী বৈজ্ঞানিক বিধান একতার সূত্রে গ্রথিত হবে, ততই তাদের প্রত্যেকের ব্যবহারিক উপযোগিতা ও বৃদ্ধি পাবে।

জীবনযাত্রার উপাযোগীতাই ব্যবহারিক জ্ঞানের লক্ষণ। কিন্তু যারা পারমার্থিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের পার্থক্যের কথা বলেন, তাঁরা এটাও বলতে চান যে ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয় সত্য নয়, কিংবা তা অপূর্ণ সত্য। কেউ কেউ এ রকম বলেন যে, ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয় মিথ্যা অবভাস। ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয় যে একটা কিছু, এটি অবশ্য সকলকেই কোন না কোনোভাবে স্বীকার করতে হবে; কারণ ব্যবহারিক জ্ঞান নিশ্চই নিজে একটা কিছু। তা নাহলে, 'ব্যবহারিক জ্ঞান' এই কথাটি নিরর্থক হয়ে পড়বে সুতরাং ব্যবহারিক জ্ঞানের বিষয়টি ও কিছু একটা হতে বাধ্য। ব্যবহারিক সৎ প্রকৃত সৎ নয়, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তা অসৎ। তা সৎ বলে প্রতীয়মান হলেও, তাত্ত্বিক বিবেচনায় সৎ নয়, অসৎ।[৩] মায়াবাদীগণ প্রতীতিত সৎ কিন্তু তত্ত্বত সৎ নয়, এই রূপ বস্তুকে অসৎ বলতে বহু সময়ে সমর্থ হন না। এদের কে সৎ ও নয়, অসৎ ও নয়, এই ভাবে সদঅসদভ্যামঅনির্বাচ্য বলে নির্দেশ করেন।[৪] আমরা এই প্রবন্ধে মিথ্যা বস্তুকে অসৎ বলে অভিহিত করবো।

যা সত্য বলে প্রতীয়মান অথচ প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়, তাকে অসৎ নামে নির্দেশ করে, আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি - যার সম্বন্ধে কোনো প্রকার সত্য অথবা প্রামানিক বিধানকথা সম্ভবপর, সেটিকে অসৎ বলা চলে কি? যা প্রকৃতপক্ষে অসৎ, তার সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে সত্য অথবা প্রামানিক কথা আদৌ সম্ভবপর কি? অসৎ বস্তু সম্বন্ধে সত্য বিধান হতে পারে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 426 - 431
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মায়াবাদী বলতে পারেন - ব্যাবহারিক সৎ সম্বন্ধে যে প্রামাণিক জ্ঞান হয়, তার প্রামান্যও তাত্ত্বিক বা প্রকৃত প্রামান্য নয়, কিন্তু এই প্রামান্যও ব্যবহারিক মাত্র, সেটিও জীবনযাত্রার ব্যাপারে কার্যপোযোগী-এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু আমরা এখানে মায়াবাদীকে আবার জিজ্ঞাসা করতে পারি, মিথ্যা বস্তুর মিথ্যাত্বজ্ঞানের প্রামান্যকে অতাত্ত্বিক বলার হেতু কি? মিথ্যা বস্তুর মিথ্যাত্ব জ্ঞানের কি কখনও বাধ হতে পারে? যদি তা হয়, তাহলে, ঐ বস্তুর মিথ্যাত্বই মিথ্যা হবে, ঐ বস্তু সৎ বা তাত্ত্বিক বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য হবে। মিথ্যাবস্তুর মিথ্যাত্বজ্ঞান সদবস্তুর প্রামানিকজ্ঞান উৎপন্ন করার ব্যাপারে সাহায্য করে, এই অর্থে সেটিকে ব্যবহারিক বলা যেতে পারে অবশ্যই। তথাপি এই ব্যবহারিকতার মধ্যে অতাত্ত্বিকতার লেশ মাত্রও আছে কি? মিথ্যাবস্তুর মিথ্যাত্বজ্ঞানকে প্রকৃতপক্ষে প্রামাণিক অথবা তাত্ত্বিক বলে স্বীকার করতে হবে। মিথ্যা বস্তুর কথা ছেড়ে দিলেও, যে বস্তু এককালে ছিল কিন্তু এখন নেই, এমন বস্তু সম্বন্ধে আমরা সঙ্গতভাবেই বলতে পারি যে, সেটি অসৎ; এবং এই জ্ঞানকে কেউ কোন কারণেই অপ্রামানিক বলতে পারবেন না।[৫] ন্যায়সূত্রের ভাষ্যতে আচার্য বাৎস্যয়ন 'তত্ত্বজ্ঞান' শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, সৎবস্তুকে সৎ বলে জানা সৎবস্তুর তত্ত্বজ্ঞান, আর অসৎবস্তু কে অসৎ বলে জানা অসৎবস্তুর তত্ত্বজ্ঞান।[৬] অতএব, মিথ্যাবস্তু বলে কিছু থাকলে, তার মিথ্যাত্ব জ্ঞান নিশ্চই মিথ্যাবস্তুর তত্ত্বজ্ঞান বলে বিবেচিত হওয়া উচিত; এবং এই তত্ত্বজ্ঞানকে মিথ্যা বলে বোঝার কোনো সম্ভাবনা না থাকায়, সেটিকে বাস্তবিক প্রমাজ্ঞানই বলতে হবে। সুতরাং, এই প্রকৃত প্রমাজ্ঞানের বিষয় যে, মিথ্যাতত্ত্ব, তাকেও সত্যবিষয় বলে গ্রহণ করা অতিআবশ্যক। কারণ, প্রমাজ্ঞানের বিষয় মাত্রই সত্য। সত্য মানে বর্তমান কালে বিদ্যমান এমন নাও হতে পারে। যে ঘটটি ভেঙে গেছে, তা বর্তমান কালে বিদ্যমান নয়, তবুও তার সম্বন্ধে আমরা যদি 'ওটি নাই', অথবা 'ওটি অসৎ' এইরূপ জানি, তাহলে আমাদের প্রমাজ্ঞানই হবে। সুতরাং, প্রমাজ্ঞানের বিষয় কোনো না কোনো কালে সৎ, এটি অবশ্য স্বীকার্য। অতএব, মিথ্যাবস্তুর সম্বন্ধে আমাদের যখন 'ওটি মিথ্যা' - এই ভাবে অবাধিত ও বাধাযোগ্য জ্ঞান হয়, তখন এটি মানাও আবশ্যক যে, মিথ্যাস্বরূপ ধর্ম এবং এই ধর্মের ধর্মী যে মিথ্যাবস্তু, তারাও কোনো না কোনোকালে বিদ্যমান। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে - শুক্তিতে প্রতীয়মান মিথ্যা রজত কি কোনকালেই বিদ্যমান? যদি তা হয়, তাহলে বলতে হবে যে, ওটি মিথ্যা নয়; এবং এরূপ বস্তুর সম্বন্ধে 'বাধ' শব্দের একমাত্র অর্থ এই হবে যে, ওটি এককালে ছিল কিন্তু এখন ওটির নাশ হয়েছে। অর্থাৎ, শুক্তিরজতও কুম্ভকার নির্মিত ঘটের ন্যায় উৎপত্তি - বিনাশশীল এক প্রকার সত্যবস্তু হয়ে পড়বে। তখন সেটিকে মিথ্যা - এই আখ্যা কি প্রকারে দেওয়া সঙ্গত হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, মায়াবাদী মিথ্যাবস্তুর কোনোকালেই প্রকৃত সত্তা স্বীকার করেন না। এটাই মায়াবাদী শুক্তি - রজতের ত্রিকালিক নিষেধ হয় এই কথাদ্বারা ব্যাক্ত করেন। কিন্তু তবুও আবার এখানে আগের প্রশ্নই ওঠে, এই ত্রিকালিক নিষেধের নিশ্চয় কে প্রামানিক এবং তজ্জন্য সেটির বিষয়কে সত্য বলে না মেনে অন্য কোনো উপায় আছে কি? অথচ যদি কোনো কিছু সম্বন্ধে ত্রিকালিক নিষেধ ঠিক ঠিক ভাবে করা সম্ভবপর হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐ নিষেধের বিষয় কোনো অর্থেই সৎ নয়। সুতরাং, প্রামানিক ত্রিকালিক নিষেধই আদৌ সম্ভবপর নয় - এইটা একবারে বাজে কথা। ওটি কতকগুলি সার্থক শব্দের সমষ্টি হতে পারে, কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই শব্দ গুলি অর্থহীন। ত্রিকালিক নিষেধ অসম্ভব; আর তার বিষয়ও অসম্ভব। বন্ধ্যাপুত্রের নিষেধের মতো তুচ্ছ এবং তার বিষয় ও তুচ্ছ।[৭]

এই জন্যে সৎ নয় অথচ সৎ বলে প্রতীয়মান, এই অর্থে 'মিথ্যা' পদার্থ অনেক দার্শনিক স্বীকার করেন না। তাহলে কি 'মিথ্যা' শব্দটি নিরর্থক? মিথ্যা বলতে সাধারণ লোক ঠিক কি বোঝে? এই প্রশ্নের উত্তর নৈয়ায়িক মত অনুসরণ করে খানিকটা দেওয়া যেতে পারে। নৈয়ায়িক মতে, 'মিথ্যা' শব্দটি বর্তমান প্রসঙ্গে একপ্রকার জ্ঞানের ধর্ম বলে বুঝতে হবে। অপ্রমা অথবা ভ্রান্তিকেই মিথ্যাজ্ঞান বলা হয়। বিদ্যমান নয় এমন ধর্মকে প্রকার করে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে অপ্রমা বলা হয়। মিথ্যাত্ব অপ্রমা জ্ঞানের একটি সত্য ধর্ম।

অপ্রমা অথবা মিথ্যা জ্ঞানও এক প্রকার জ্ঞান; সুতরাং সেটিও একটি সৎ পদার্থ।[৮] মিথ্যাত্বের এই রূপ ব্যাখ্যা দেওয়ার ফলে, নৈয়ায়িকদেরকে মায়াবাদীদের মতো করে 'সৎ নয় অথচ সৎ বলে প্রতীয়মান' এই রকম একটা অসম্ভব পদার্থ মানতে হয় না। আমরা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাতেও জ্ঞান ব্যাতিরেকে অন্যান্য কোনো কোনো পদার্থ সম্বন্ধেও 'মিথ্যা' শব্দের প্রয়োগ করে থাকি। মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষ্য - এই ধরণের বহু প্রয়োগ সাধারণ ভাষাতে হয়। কিন্তু একটু সজাগ দৃষ্টি দিলেই লক্ষিত হবে যে, এই সকল স্থলেও 'মিথ্যা' শব্দের অর্থ মূলত অপ্রমার সঙ্গেই সম্বন্ধিত। কোনো স্থলেই 'মিথ্যা

'শব্দের প্রয়োগে শব্দটি' সৎ বলে প্রতীয়মান, অথচ সৎ নয়' এই রকমের কোনো অর্থ সূচনা করে না। যদিও মায়াবাদীগণ ৯ এর সবটাই মেনে নেননি। মায়াবাদীগণ প্রশ্ন তোলেন, যখন শুক্তিকে রজত বলে ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়, তখন এই ভ্রান্তি র বিষয়টি কি? নৈয়ায়িকগণ প্রত্যত্তরে বলেন যে, এই বিষয়টি হল সম্মুখবর্তী বস্তু, যা আসলে শুক্তি; অবশ্য আমরা যে পদার্থটিকে ভুল করে জানি, কোনো এক অর্থে সেটিকেই উক্ত ভুল জানার বিষয় বলা যেতে পারে। কিন্তু কেউ যখন বলেন যে, স্বপ্নে উন্মত্ত হাতি দেখে ভীত হয়েছিলাম, তখন এই হাতির ভ্রান্ত দৃষ্টি র বিষয় কি? স্বপ্নের ক্ষেত্রটি যদি বাদও দেওয়া হয়, মরুতে যখন জল বলে দৌড়ে যাই তখন সেই ভ্রান্তির বিষয়টি হয়তো কোনো অর্থে মরু অথবা সূর্যকিরণ, কিংবা এই দুয়ের মিশ্রণ। কিন্তু কোনো মরীচিকা প্রতারিত ব্যাক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সেখানে কি দেখলে? তাহলে, তার উত্তরে সে 'মরু দেখলাম' এই রকম নিশ্চই বলবেন না। ঠিক তেমন ভাবেই যে ব্যাক্তি তার সম্মুখস্থ শুক্তিকে ভুলে রজত বলে জানলো, ভুল দূর হওয়ার আগে তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার সামনে কি দেখলে? তাহলে সে নিশ্চই 'শুক্তি দেখলাম' এই রূপ বলবে না। এমন কি, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য না থাকলে, সে এই রূপ বলবে না যে, সম্মুখে কিছু একটা জিনিস দেখলাম। সে সাধারণভাবেই জবাব দেবে- 'আমি সেখানে রজত দেখলাম'। প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্তির সময়ে সে যদি তার ভ্রান্তজ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশ করে, তাহলে সে আলোচ্য স্থলে 'এটি রজত' এই রূপই বলবে। বর্তমান স্থলের ভ্রান্তির বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত তিনটি পদার্থ পাওয়া যাবে - ক. 'এটি' অর্থাৎ সম্মুখস্থ কোনো পদার্থ; খ. রজতত্ব এবং গ. 'এটি' ও রজতত্বের মধ্যে ধর্মধর্মীরূপ সম্বন্ধ বিশেষ। প্রথম দুটি পদার্থ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, সেগুলি সৎ বলে প্রতীয়মান এবং বস্তুতই সৎ, কিন্তু প্রশ্ন হল তৃতীয় পদার্থটি নিয়ে। সেটি কি প্রকৃতপক্ষেই সৎ? তর্কের খাতিরে স্বীকার করি যে, 'এটি' শব্দের দ্বারা ব্যক্ত পদার্থটি জ্ঞাতার সম্মুখে বিদ্যমান; রজতত্ব ও প্রকৃত রজতে বিদ্যমান; আরও স্বীকার করা হল যে, ধর্মধর্মীভাব রূপ সম্বন্ধে বিশেষও বহু স্থলে বাস্তবিকই বিদ্যমান। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় 'এটি' নামক পদার্থটির সাথে রজতত্ব এর ধর্মধর্মী সম্বন্ধটি বাস্তব, না অবাস্তব? এই কথা স্পষ্ট যে, 'এটি' নামক বস্তুটি যদি শুক্তি হয়ে থাকে, তাহলে 'এটি'র সাথে রজতত্বের ধর্মধর্মী ভাব থাকতে পারে না, অথচ আমাদের বর্নিত রজতজ্ঞানের স্থলে 'এটি'র সঙ্গে রজতত্বের এইরূপ অবিদ্যমান সম্বন্ধই বিদ্যমান বলে প্রতীত হয় অর্থাৎ, ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়ে অন্ততঃ একটি অংশ সৎ বলে প্রতীয়মান, অথচ সৎ নয়, এরূপ বলা ঠিক হবে। তাছাড়া, যদিও আমরা ভ্রান্তজ্ঞানের বিষয়টিকে তিনটি পৃথক অংশে বিশ্লেষণ করেছি, তথাপি সমগ্র বিষয়টি এই তিনের সমষ্টিমাত্র নয়। বরং বিষয়টি হল সেগুলির এমন একটি সামগ্রিকরূপ, যাকে রজতত্ববিশিষ্ট পুরোবর্তী দ্রব্য বলে বর্ণনা দেওয়া সঙ্গত হবে। এবং এখানেও আবার প্রশ্ন উঠবে, এই যে রজতত্ববিশিষ্ট পুরোবর্তী দ্রব্য, এটি সত্য বলে প্রতীয়মান হলেও, প্রকৃতপক্ষে কি সত্য? আমরা এখানে বুঝতে চাইছি, রজতত্ব বিশিষ্ট 'এটি' অর্থাৎ রজতত্ববিশিষ্ট পুরোবর্তী শুক্তি কোনো অর্থে কি সৎ বলে গৃহীত হতে পারে? যদি না পারে, তাহলে এই কথা মেনে নিতে হয় যে, মিথ্যা প্রত্যয় এর বিষয়টি এমন এক অদ্ভুত ধরণের পদার্থ, যা সত্য বলে প্রতীয়মান হলেও সত্য নয়।[১০]

উৎপত্তিবিনাশশীল শুক্তি-রজতের গ্রাহক একটি উৎপত্তিবিনাশশীল জ্ঞানও স্বীকার করা আবশ্যক। কেননা এই জ্ঞানটি শুক্তি-রজতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শুক্তি-রজতের মিথ্যাত্ব স্বীকৃত হলে এই জ্ঞানের ও মিথ্যাত্ব অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু এই মিথ্যাজ্ঞানের স্বরূপ নৈয়ায়িকসম্মত অপ্রমা অথবা ভ্রান্ত জ্ঞানের মতো নয়। নৈয়ায়িক এর মতে ভ্রান্তপদার্থটি বস্তুত সত্য; তা এক প্রকার জ্ঞানও। সেই জ্ঞানটি সম্যকখ্যাতি না হয়ে অন্যথাখ্যাতি হয়। মায়াবাদীরা বলেন, মিথ্যাজ্ঞান নিজেও সদঅসদভ্যামঅনির্বাচ্য, অর্থাৎ তা এমন এক প্রকার সদবস্তু নয়, যাতে অপ্রামান্য নামক একটি বাস্তবিক ব্যাপার রয়েছে; তা নিজেও মিথ্যা। অনেকে বলবেন যে, ভ্রান্তিকে অন্তত এক প্রকার কল্পনা বলে স্বীকার করতে হবে। বিচার করলেই বোঝা যায় যে, আমরা যখন সজ্ঞানে কোনোকিছুর কল্পনা করি, তখন ঐ কল্পনা আমাদের প্রতারনা করতে পারে না, যেমনটা ভ্রান্তি করে থাকে। সুতরাং যে কল্পনায় জ্ঞানত্বের আরোপ করা হয়েছে, তার প্রকৃত স্বরূপ কল্পনা নয়। সেই হেতু জ্ঞানত্ব আরোপিত কল্পনাকেও সদঅসদভ্যাম অনির্বাচ্য বলতে হব।[১১]

অদ্বৈতমতে এই কল্পনার স্থান কোথায়? এই কল্পনা মানে আত্মার স্বরূপ যে চৈতন্য, তাইই। শুদ্ধরূপে এই চৈতন্য শুধু প্রকাশ, ক্রিয়াত্মক কল্পনা নয়। প্রশ্ন হবে, তাহলে আমরা কল্পনাকেই আত্মার স্বরূপ বলে নির্দেশ করি কিভাবে? মূল - অবিদ্যামিশ্রিত - চৈতন্য অথবা মূল কল্পনা এর আদি নেই; অতএব এর কারণ কিংবা হেতু নির্দেশ করা যায় না। বস্তুত

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 426 - 431
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তার হেতু নেই, এরূপ বলা অধিক সঙ্গত হবে। অবিদ্যা কিংবা জগৎরূপ বিষয় মিথ্যা বলে বিষয়সম্বন্ধ চৈতন্য কিংবা মূল অবিদ্যা মিশ্রিত চৈতন্য প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধচৈতন্যই। তাই তা আত্মারই স্বরূপ। মিথ্যাজ্ঞান বা জ্ঞান আরোপিত কল্পনাকেই ব্যবহারিক দৃষ্টি বলা হয়।

কিন্তু অদ্বৈতমতে পারমার্থিক দৃষ্টির স্থান কোথায়? পারমার্থিক দৃষ্টিকে নিশ্চয়ই নিত্য বলা চলে না; কারণ, তাহলে ব্যবহারিক অথবা মিথ্যাদৃষ্টি আদৌ সম্ভবপর নয়। প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক দৃষ্টির প্রধান কাজ হল মিথ্যা দৃষ্টিকে দূর করে তার স্থান দখল করা। সুতরাং পারমার্থিক দৃষ্টি এমন একটি পদার্থ, যাকে অদ্বৈত তত্ত্বের সাধক স্বীয় জ্ঞান সাধনায় উৎপন্ন করতে চান।[১২] আর যে পদার্থ বর্তমানে নেই এবং পরে উৎপন্ন হবে, তা কিছুতেই দেশকাল অবছিন্ন নিত্যসৎ ব্রহ্মতে থাকতে পারে না। অতএব, পারমার্থিক দৃষ্টির সত্তা পারমার্থিক নয়, কিন্তু ব্যবহারিকও মিথ্যা। যদি তাই হয়, তাহলে পারমার্থিক দৃষ্টিকে সম্যক বা সত্যদৃষ্টি বলা সঙ্গত হবে কি? তাছাড়া, পারমার্থিক দৃষ্টির অবস্থিতিকালে এই দৃষ্টি ও কূটস্থ ব্রহ্ম, এই দুই বিদ্যমান থাকায় আত্মা স্বকীয় অদ্বয় রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

মায়াবাদে সম্যক তত্ত্বদৃষ্টির অপর নাম ব্রহ্মাকারবৃত্তি। ব্রহ্মাকারবৃত্তির ব্যবহারিক ও মিথ্যা।[১৩] উৎপন্ন পদার্থ মাত্রই যে মিথ্যা, তা পূর্বে বলা হয়েছে। এই মিথ্যাত্বপ্রকারক জ্ঞানের আওতায় ব্রহ্মাকারবৃত্তি ও একটি উৎপন্ন পদার্থ রূপে পড়ে, এমনকি উক্ত পরোক্ষ মিথ্যাত্বজ্ঞান ও পড়ে। এই মিথ্যাত্বজ্ঞানের পরিপাকে অন্ত করণে এর একটি দৃঢ় সংস্কার জন্মে; এবং এই সংস্কারবশত যে কোনো উৎপন্নবস্তুই সেটি উৎপন্ন হওয়া মাত্র জ্ঞাতার কাছে মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয়; তাই ব্রহ্মাকারবৃত্তি যখন উৎপন্ন হয়, তখন তার সত্যতার জ্ঞানের কোনো কথাই ওঠে না। তাহলে পূর্বোক্ত আপত্তি থেকে যায় যে, মায়াবাদে অদ্বৈত অবস্থা প্রাপ্তিই মোক্ষ। কারণ সেটিই আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি এবং সেটাই মোক্ষ অবস্থা। কিন্তু ব্রহ্মাকারবৃত্তি আত্মার স্বরূপ নয়; কারণ, তা আধ্যাত্মিক জ্ঞানসাধনায় উৎপন্ন করতে হবে। আত্মা হল নিত্য পদার্থ; এমন অবস্থায় যখন ব্রহ্মাকারবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তখন নিশ্চয়ই অদ্বৈতবস্থা থাকে না। কারণ, তখন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাকারবৃত্তি অন্ততঃ এই দুটি পদার্থ বিদ্যমান থাকে; অর্থাৎ পারমার্থিক দৃষ্টি থাকাকালে অদ্বৈতবস্থা না থাকায়, মোক্ষবস্থা লাভ হয়েছে, এরূপ বলা সঙ্গত নয়। তাছাড়া, ব্রহ্মাকারবৃত্তি মানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা। কিন্তু ব্রহ্মাকারবৃত্তি থাকাকালে ব্রহ্মকে সঅদ্বৈত বলাই সমীচীন হবে। অতএব, তখন তাকে অদ্বৈত বলে উপলব্ধি করলে, এই উপলব্ধিকে অপ্রমা না বলে অন্য উপায় কি আছে? অর্থাৎ, মায়াবাদে পারমার্থিক দৃষ্টি কখনও প্রমা পদবাচ্য হতে পারে না আর অপ্রমাদ্বারা অজ্ঞান দূর করা অসম্ভব। মায়াবাদীরা এই আপত্তির উত্তরে বলেন যে, দ্বৈত প্রতিজ্ঞানের সময়েও অর্থাৎ সংসারদশা তেও ব্রহ্ম এর অদ্বৈতস্বরূপের কোনোরকম বাস্তবিক চ্যুতি হয় না। সুতরাং ব্রহ্মাকারবৃত্তি থাকাকালেও ব্রহ্ম অদ্বৈতই থাকে, এবং তখনও তাকে অদ্বৈত বলে জানলে সত্য বস্তুকে তার সত্য স্বরূপেই জানা হবে। ব্রহ্ম এর সপ্রপঞ্চতা ভ্রান্তিজনিত, এবং এই ভ্রান্তিই সংসারের হেতু; সংসারের হেতুভূত এই ভ্রান্তিকে দূর করার জন্যই ব্রহ্মাকারবৃত্তির অবশ্যকতা। যাঁর এই ভ্রান্তি নেই তার প্রপঞ্চও নেই। সুতরাং তার জন্য ব্রহ্মাকারবৃত্তিও অনাবশ্যক।

সুতরাং পরিশেষে এটাই প্রতিপাদন হয় যে, পারমার্থিক দৃষ্টির ধারণাটি অযৌক্তিক নয়। কিন্তু কোন ধারনা যুক্তিবিরুদ্ধ না হলেই যে তা সত্য হবে এমন নয়। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টির অধিকারী হওয়া যায় কিরূপে? পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিচারের সাহায্যে এই দৃষ্টিকে আয়ত্ত করা সম্ভব হলে কোন না কোন অর্থে এই দৃষ্টিকে প্রথম থেকেই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান বলে ধরতে হবে। আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে, বিচারের সাহায্যে পারমার্থিক দৃষ্টির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না হলেও বলা যায় না যে,পারমার্থিক দৃষ্টির ধারণাটি অবাস্তব। কারন এমন হতেই পারে যে আমাদের বিচার প্রণালী সম্মকপথে পরিচালিত হয়নি। সাধারণ জীবনযাত্রায় আমরা কতকগুলি স্বাভাবিক ইচ্ছা দেশ তৃষ্ণা ইত্যাদি দ্বারা চালিত হয়ে থাকি। সাধারণ জীবনের এই তৃষ্ণা গুলিকে অলৌকিক নাম দেওয়া সঙ্গত হবে না। এটিই হল আধ্যাত্মিক মুক্তির তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণাবাস্তবে হয়ে থাকলে বলতে হবে এর পূর্তিও সম্ভব পর। বলা ভালো ওই পূর্তির সহিত আমাদের প্রথম থেকেই আমাদের পরিচয় আছে। তা না হলে তার আমাদের আকাঙ্ক্ষা হবে কেন? বিচারের দার্শনিক উদ্দেশ্য হল এই সামান্য পরিচয় কে গাঢ় ও সুস্পষ্ট করা। এই সুস্পষ্ট করণের অপর নাম ব্রহ্মাকারবৃত্তি। এটিই হল পারমার্থিক দৃষ্টি।

Reference:

১. বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় নীতিবিদ্যা, কলকাতা, প্রগ্রতিশীল প্রকাশক, 2004, পৃ. ৪৭

২. চক্রবর্তী, নীরদবরণ, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা, দত্ত পাবলিশার্স, পৃ. ২৯৮

৩. তদেব, পৃ. ৩০০-৩০৪

৪. পাল, সন্দীপ ও আনিসুজ্জামান, মো: (সম্পাদক); চৌধুরী, রমা, বেদান্ত দর্শন, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, মার্চ -2022, পৃ. ১৫-১৬

৫. ভট্টাচার্য, করুণা, অদ্বৈতসিদ্ধি (ইংরাজী অনুবাদ) নিউ দিল্লী, আইসিপিআর পৃ. viii-ix

৬. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়দর্শন (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জুলাই-1981, পৃ. ১৬-২০

৭. পাল, সন্দীপ ও আনিসুজ্জামান, মো: (সম্পাদক); চৌধুরী, রমা, বেদান্ত দর্শন, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, মার্চ -2022, পৃ. ১৬২

৮. ভট্টাচার্য, করুণা, অদ্বৈতসিদ্ধি (ইংরাজী অনুবাদ) নিউ দিল্লী, আইসিপিআর পৃ. ১৮৪-১৯০

৯. পাল, সন্দীপ ও আনিসুজ্জামান, মো: (সম্পাদক); চৌধুরী, রমা, বেদান্ত দর্শন, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, মার্চ -2022, পৃ. ২২৯-২৩২

১০. ভট্টাচার্য, মোহন ও ভট্টাচার্য, দীনেশচন্দ্র, ভারতীয়দর্শনকোষ (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, 1383 বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭০-৭১

১১. চৌধুরী, রমা, বেদান্ত দর্শন, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, 1351 বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০

১২. তদেব, পৃ. ১২

১৩. পাল, সন্দীপ ও আনিসুজ্জামান, মো: (সম্পাদক); চৌধুরী, রমা, বেদান্ত দর্শন, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, মার্চ, 2022, পৃ. ১৬৪-১৬৬